আর জি কর : ১৭৫ বর্ষের প্রাক্কালে

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত
চিকিৎসক, গবেষক ও সাহিত্যিক

শিরোনামে সচেতনভাবেই বিলাতি ধাঁচে তাঁর সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহার করা হল। কারণ আত্মবিস্মৃত বাঙালি এই বহুপ্রতিভাধর রেনেসাঁস পুরুষের পুরো নামটি যে রাধাগোবিন্দ কর, সেকথা খেয়াল রাখেনি। তাঁকে মনে রেখেছে শহর কলকাতার এক সুপ্রাচীন সরকারি মেডিক্যাল কলেজ তথা হাসপাতালের নাম হিসেবে।

সে-সুযোগও অবশ্য নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পর কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের এক দেশীয় নাম দেওয়ার কথা তখন ভাবা হচ্ছে। ভাবা হচ্ছে, ডা. করের স্বপ্নসম্ভব এই প্রতিষ্ঠান তাঁর নামেই নামাঙ্কিত হোক। এই সময় কলকাতার এক ধনী ব্যবসায়ী কলেজ তহবিলে দুই লক্ষ টাকা দান করার কথা ঘোষণা করেন। শর্ত একটিই : তাঁর পরিবারের কোনও সদস্যের নামে রাখতে হবে কলেজের নাম। কলেজে তখন চরম আর্থিক সংকট। সেই যুক্তিতে কলেজ কমিটি প্রস্তাবে সায় দিয়ে দেয়। সৌভাগ্যের কথা, পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের হস্তক্ষেপে সেই প্রস্তাব

নাকচ হয়। জন্মদাতার নামেই ১৯৪৮ সালে তার নামকরণ হয় 'আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল'।

কিন্তু সে অনেক পরের কথা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের ঠিক পরবর্তী সেই বছরের থেকে অনেকটা পিছিয়ে আমরা চলে যাচ্ছি স্বাধীনতা হারাবার পূর্ববর্তী বছরে। রাধাগোবিন্দের শেকড় খোঁজা শুরু হোক সেখান থেকেই।

শেকড়ের সন্ধান

হাওড়া জেলার রামরাজাতলার কাছেই সাঁতরাগাছি এলাকায় বেতড় গ্রাম। সেখানে পলাশী যুদ্ধের এক বছর আগে, ১৭৫৬ সালে বসতবাড়ি তৈরিতে হাত দেন জয়রাম কর। টলটলে দিঘির পাশের সেই মনোরম অট্টালিকা সম্পূর্ণ করেন রামচন্দ্র কর। সেই বিখ্যাত কর বাড়িতে ২৩ অগস্ট ১৮৫২ (মতান্তরে ১৮৫৩) রাধাগোবিন্দের জন্ম। তাঁরা বরাবরই আর্থিকভাবে অত্যন্ত সম্পন্ন। রাধাগোবিন্দের প্রপিতামহ রামমোহন ছিলেন নীলকুঠির মালিক। পিতামহ ভৈরবচন্দ্র কলকাতা হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠিত উকিল। পিতামহী হাইকোর্টের আর এক আইনজীবী গোপাললাল মিত্রের বড় বোন। বাবা দুর্গাদাস বিশিষ্ট চিকিৎসক ও শিক্ষাবিদ। তাঁর বিয়ে হয় কলকাতার হোগলকুড়িয়া নিবাসী তাঁরই সমনামী দুর্গাদাস ঘোষের মেয়ের সঙ্গে। তাঁদের প্রথম পুত্র রাধাগোবিন্দ ওরফে গোবি। গোবির পাঁচ বোন, তিন ভাই—রাধামাধব, রাধারমণ ও রাধাকিশোর।

ডাক্তার দুর্গাদাস চাকরি সূত্রে বরিশালে এবং পরে ঢাকায় কর্মরত ছিলেন। ঢাকার মিডফোর্ড হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এই প্রেক্ষিত মাথায় রেখে কোনও কোনও জীবনীকার ভেবেছেন ঢাকায় রাধাগোবিন্দের জন্ম ও বড় হয়ে ওঠা। কিন্তু কর পরিবারের সচেতন পরবর্তী প্রজন্ম অচিরেই এই ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন : শুধু জন্ম নয়, রাধাগোবিন্দের অঙ্কুরোদ্গমও সাঁতরাগাছির শ্যামলিমায়।

জিমনাস্টিক্স্, নাটক, ডাক্তারি

রাধাগোবিন্দকে ভর্তি করা হয় কলকাতার হেয়ার স্কুলে। পরে সম্ভবত হিন্দু স্কুলে। সেই সময় হাওড়া ব্রিজ দূরস্থান, গঙ্গার ওপর ভাসমান পনটুন ব্রিজও তৈরি হয়নি। বালক গোবিকে বাড়ির ঘোড়ার গাড়ি করে হাওড়ার গঙ্গার ঘাটে পৌঁছে, নৌকা করে নিত্য কলকাতা যেতে হত।

মেধার সঙ্গে সমাজমনস্ক কর্মোদ্যোগের যে-বিরল সমন্বয় ভবিষ্যতের রাধাগোবিন্দকে বিশিষ্টতা দিয়েছে, তার স্পষ্ট আভাস পাওয়া গিয়েছিল তাঁর বিদ্যালয় জীবনেই। পিতা দুর্গাদাস জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তাঁর নিজের পেশায় নিয়ে আসতে চাইলেন। কিন্তু, ভাবতে অবাক লাগে, প্রাতঃস্মরণীয় চিকিৎসক রাধাগোবিন্দ তাঁর কৈশোরে ডাক্তারি পড়তে মোটেও আগ্রহী ছিলেন না। পিতার কঠোর শাসনে তিনি ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসতে বাধ্য হন এবং সহজেই সম্ভ্রান্ত বেঙ্গল (পরবর্তী কালে, কলকাতা) মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পান। ডাক্তারি পড়ার সুবিধার জন্য পিতা তাঁকে শ্যামবাজারে একটি বাড়ি তৈরি করে দেন।

কিন্তু মধ্য কলকাতায় তাঁর এই আবাস চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে তাঁকে মোটেও উদ্বুদ্ধ করে না। বরং তাকে অবহেলা করে তাঁর কম বয়সের

প্যাশনকে নিয়ে এগিয়ে যেতে পরিবেশগত আনুকূল্য দেয়। স্পষ্ট করে বলা যাক সেই দুই প্যাশনের কথা, যা এক সময় ভবিষ্যতের ডা. আর. জি. কর-এর ডাক্তার হওয়ার পথ আগলে রাখত : একটি জিমনাস্টিক্স আর অপরটি নাটক। এতই প্রবল আবেগ এবং আগ্রহ জড়িয়ে ছিল এই দুই চর্চার সঙ্গে যে, তার বিবরণ না শোনালে রাধাগোবিন্দের জীবনকাহিনিতে ফাঁক থেকে যাবে।

প্রথমে জিমনাস্টিক্স্-এর কথা বলি। শারীরিক কসরতের এই উদ্যোগে তিনি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। নিকট-বয়সী উৎসাহীদের একজোট করে তিনি এক পারদর্শী দল তৈরি করেছিলেন। তাঁর পরের ভাই, এই দলের অন্যতম সদস্য রাধামাধবের স্মৃতিচারণ থেকে বুঝতে পারা যায় এ নিয়ে তাঁদের আগ্রহ কতটা গভীর ছিল : 'আমরা যখন জিম্‌নাস্টিক করি, তখন আমাদের ভলন্টীয়ার হইবার খুব সখ্ হইয়াছিল। ইয়ুরেশিয়ানরা তখন সবেমাত্র সখের সেনা হইবার অধিকার লাভ করিয়াছে দেখিয়া আমাদের ঝোঁক হইল।' সে-পরিকল্পনা বাস্তবায়িত না হলেও টানা প্রায় দশ বছর রাধাগোবিন্দ তাঁর জিমনাস্টিক দলের সংগঠন নিয়ে মনোযোগী ছিলেন। দলের সদস্যরা যাতে পেশাগতভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁদের নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারেন তার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন।

সক্ষম শরীরের নমনীয়তা মঞ্চশিল্পীর এক জোরের জায়গা। বোধহয় তাই শরীরচর্চা আর নাট্যাভিনয়ের মধ্যে বিরোধ তো নয়ই, মেধাবী রাধাগোবিন্দ তাঁর এই দুই প্যাশনকে পরস্পরের পরিপূরক করে নিয়েছিলেন। 'নীলদর্পণ'-খ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ছিলেন দুর্গাদাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণেই বড় দুই ভাই রাধাগোবিন্দ এবং রাধামাধব ছাত্রাবস্থাতেই মঞ্চাভিনয়ে আকৃষ্ট হন। অবিভক্ত বাংলায় তখন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণ ঘটছে। কলকাতা তার প্রধানতম কেন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'থেটারে লোকশিক্ষে হয়' বাণীকে মাথায় রেখে নাট্যমঞ্চ সেই নবজাগরণের এক গুরুত্বপূর্ণ ধারা।

১৮৬৮ সালে, বছর ১৬ বয়সের রাধাগোবিন্দ 'বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার' নামে এক দল বাঁধেন। আশ্চর্যের কথা, যিনি নিয়মিত ব্যায়াম করে শরীরকে শক্ত-সমর্থ করে গড়ে তুলেছেন, রঙ্গমঞ্চে তিনিই আবির্ভূত হতেন পেলব চেহারায়! স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয়ে তিনি সুনাম অর্জন করলেন। দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' নাটকে সারদাসুন্দরীর ভূমিকায় তাঁর অভিনয় নাট্যামোদী মহলে সাড়া ফেলে দেয়। রসরাজ অমৃতলাল বসু স্মৃতিচারণ করেছেন, "মেয়ো হাসপাতালের সাহায্যার্থে কলকাতার টাউন হলে 'নীলদর্পণ' অভিনীত হইল। আমি [সেই ১৮৭৩ সালের মার্চ মাসে] দুই টাকা দর্শনী দিয়া অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। যতদূর স্মরণ হয়, গিরিশবাবু নবীনমাধব সাজিয়া ছিলেন, মতিবাবু [মতিলাল সুর] তোরাপ, গোবি [রাধাগোবিন্দ] সৈরিন্ধ্রী...।" অমৃতলালের এই স্মৃতিচারণ থেকে আরও জানা যায়, সেই সময় তাঁদের অভিনীত মঞ্চসফল প্রহসনগুলি 'অনেকটা আমাদের মুখে মুখে রচিত'। এবং অভিনেতাদের মধ্যে যাঁরা 'মুখে মুখে একখানা impromptu farce শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে রচনা' করে নিতেন তার মধ্যে ভবিষ্যতের ডাক্তার গোবিবাবু অন্যতম।

জিমনাস্টিক্স আর নাটক—এই জোড়া-প্যাশন সামলে ডাক্তারিতে মন দেওয়া শক্ত। তাই এক

বছর পরেই তিনি সে-পড়ায় ক্ষান্তি দেন। শেষ পর্যন্ত নাট্যদল তৈরির প্রায় ১১ বছর পর তিনি ডাক্তারি পড়তে রাজি হলেন এবং পুনরায় মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার পরেও বোধ করি দোনামনা করে প্রথম এক বছর নষ্ট করলেন। তারপর যে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নে নিবিষ্ট হলেন, তার পেছনেও দুটি কারণ।

প্রথম কারণ তাঁর অকাল স্ত্রীবিয়োগ। সেকালের রেওয়াজ অনুসারে অভিভাবকেরা অপরিপক্ক বয়সেই রাধাগোবিন্দের বিয়ে দেন। অল্পবয়সিনী পত্নীর মৃত্যু তাঁকে এক বড় আঘাত দেয়। শরীরচর্চার আখড়া বা রঙ্গমঞ্চ উভয়ের প্রতি তাঁর আগ্রহ কমতে থাকে।

আর দ্বিতীয় কারণ ১৮৭৯ সালে শ্যামাপুজোর রাত। সুবীরকুমার চট্টোপাধ্যায় সেই রাতের বর্ণনা সংগ্রহ করেছেন : ''পাঁচিলে তুবড়ি রেখে বাজি পোড়ানো হচ্ছিল। বিখ্যাত ডাক্তার দুর্গাপ্রসাদ করের ছেলেরা আর কিছু প্রতিবেশী এক কনস্টেবলের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে। বিটের কনস্টেবল তুবড়িটা ফেলে দিতেই গোলমাল, কথা কাটাকাটি গড়ায় মারধরে। ডা. করের বড় ছেলে রাধাগোবিন্দ তখন বাড়ি ফিরছেন, ঘটনার কিছুই জানেন না। এদিকে পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। আসল দোষীরা পালিয়ে বেঁচে গেল আর পুলিশ রাধাগোবিন্দকে দাঙ্গাবাজ বলে শনাক্ত করল। ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড আটকানো গেল না।''

এই দুই অনভিপ্রেত ঘটনায় রাধাগোবিন্দ অনুভব করেন, পরাধীন জাতিকে, বিশেষত দরিদ্র মানুষদের সেবা করার যে-স্বপ্ন তিনি দেখেন তা আরও প্রত্যক্ষভাবে করা যাবে ডাক্তারির মাধ্যমে। ১৮৮০ সালে তিনি মেডিক্যাল কলেজে তাঁর শিক্ষায় একাগ্র হন। কৃতিত্বের সঙ্গে এল. এম. এফ. (লাইসেন্সিয়েট এক্সামিনেশন অফ মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টি) পরীক্ষা পাশ করে ১৮৮৩ সালে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিলেতে যান। তাঁর সঙ্গী ছিলেন ডা. আশুতোষ মিত্র। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একযোগে এল. আর. সি. পি. (লাইসেন্সিয়েট অফ দ্য রয়্যাল কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস্) এবং এল. এম. (লাইসেন্সিয়েট ইন মিডওয়াইফারি/ ধাত্রীবিদ্যা) ডিগ্রি লাভ করে তিনি ১৮৮৬ সালে দেশে ফিরে আসেন। প্র্যাক্টিস শুরু করেন শ্যামবাজারের নিজস্ব বাড়িতে। মেডিসিন ও শল্যচিকিৎসা উভয় ধারাতেই তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বাড়িতেই অপারেশন করতেন। তাছাড়া বিষক্রিয়ার চিকিৎসায় তাঁর খুবই সুনাম হয়। কেউ বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেই বাড়ির লোক তাঁর দ্বারস্থ হত। দ্রুত তাঁর পসার জমে ওঠে। দূরদূরান্ত থেকে তাঁর কাছে রোগী আসতে আরম্ভ করে। অভাবী রোগীদের তিনি বিনামূল্যে দেখতেন।

বাংলা ভাষায় ডাক্তারি

কিন্তু শুধু ব্যক্তিগত পসারের উন্নতি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার মানুষ রাধাগোবিন্দ নন। তাঁর সমাজসচেতন মন তাঁকে উদ্বুদ্ধ করল বাংলা ভাষায় ডাক্তারি শিক্ষা সম্ভব করার বিষয়ে উদ্যোগী হতে। মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রাবস্থায় তিনি তাঁর সহপাঠীদের দেখে অনুভব করেছিলেন, ইংরেজি ভাষায় আড়ষ্টতা চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ত্ত করায় কেমন বাধা সৃষ্টি করে।

সমস্যাটি বোঝার জন্য আমাদের দেশে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতটি বোঝা দরকার। কলকাতা মেডিক্যাল

কলেজ প্রতিষ্ঠার আগে বাংলা তথা কলকাতায় তিনটি চিকিৎসাশিক্ষা বিদ্যালয় ছিল : নেটিভ মেডিক্যাল ইনস্টিটিউশন, সংস্কৃত কলেজে মেডিক্যাল ক্লাস, আর মাদ্রাসা কলেজে মেডিক্যাল ক্লাস। এখানে হিন্দু ও মুসলিমদের প্রাচীন লোক-চিকিৎসা শেখানো হত। আর ইংরেজি ভাষার মূল ডাক্তারি বই থেকে হিন্দি, বাংলা বা উর্দুতে অপটু অনুবাদ করে কিছু শেখানোর চেষ্টা করা হত। ছাত্রদের পক্ষে এমন বিদ্যা আত্মস্থ করা প্রায় অসম্ভব হচ্ছিল। এমন পরিস্থিতিতে ২৮ জানুয়ারি ১৮৩৫ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হল। এখানে চিকিৎসাশিক্ষার মাধ্যম কী হবে তা নিয়ে ব্রিটিশদের মধ্যে প্রাথমিক বিতর্কশেষে ইংরেজিকেই বেছে নেওয়া হয়। কিন্তু এই কলেজ থেকে বিদেশি শাসকরা যে এক দেশীয় চিকিৎসক ‘ক্যাডার’ গড়ে তুলতে চাইছিলেন তার প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ইংরেজি ভাষাজ্ঞান—হিন্দু কলেজ থেকে পাশ করে আসা সামান্য কিছু ছাত্র ছাড়া আর কেউই প্রায় ইংরেজিতে সড়গড় ছিলেন না। তাছাড়া প্রবল ঔপনিবেশিক উন্নাসিকতায় ভারতবর্ষের নিজস্ব চিকিৎসাব্যবস্থার ধারণাটিকে ব্রিটিশরা মুছে দিতে চাইছিল।

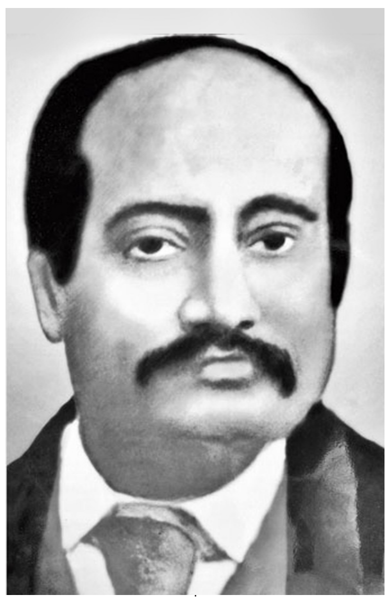

এমন সংকটের সমাধান করতে এগিয়ে আসেন ডা. কর—না, রাধাগোবিন্দ নন, তাঁর পিতা ডা. দুর্গাদাস কর। তিনি ১৮৬৮ সালে ‘ভাষজ্য রত্নাবলী’ নামে এক বই লিখে নিজেই প্রকাশ করেন। ক্রমে বাংলার চিকিৎসক মহলে—মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র থেকে পল্লীগ্রামের হাতুড়ে, সকলের কাছেই এই বই অত্যন্ত ভরসা অর্জন করে। পরবর্তী কালে এই বইয়ের পরিবর্ধিত সংস্করণ সম্পাদনা করে পারিবারিক ‘কর প্রেস’ থেকে তার প্রকাশ অব্যাহত রাখেন ডা. রাধাগোবিন্দ। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে রাধাগোবিন্দ নিজেও একটির পর একটি ডাক্তারিশাস্ত্রের বাংলা বই প্রকাশ করতে থাকেন। বাংলা-ইংরেজির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিতা এক্ষেত্রে তাঁর বাড়তি জোরের জায়গা। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় চিকিৎসা পদ্ধতি ও আধুনিক স্বাস্থ্যজ্ঞান যুগপৎ অনুধাবন করে তাঁর লেখা ‘ভিষগবন্ধু’ ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হয়—তাঁর মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার আট বছর আগে! এটি মূলত প্রেসক্রিপশন লেখার পদ্ধতি আলোচনা। এরপর, শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও, গোটা জীবন তিনি একের পর এক বই লিখে গেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি : ‘সংক্ষিপ্ত শারীরতত্ত্ব’, ‘রোগী পরিচর্যা’, ‘ভিষক সুহৃদ’ (অসলারের ‘প্রিন্সিপল অ্যান্ড প্র্যাকটিস’ গ্রন্থের অনুবাদ), ‘সংক্ষিপ্ত শিশু ও বাল চিকিৎসা’, ‘কবিরাজ ডাক্তার সংবাদ’, ‘প্লেগ্’।

শেষোক্ত বইটির ভূমিকায় রাধাগোবিন্দ লিখেছিলেন, ‘‘এই পুস্তিকা রচনাকালে আমার লক্ষ্য ছিল রোগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, তার কারণ, বৈশিষ্ট্য এবং যুক্তিযুক্ত চিকিৎসা সম্পর্কে বিভিন্ন

সূত্রে আমি যা আহরণ করতে পেরেছি, তা মাতৃভাষায় শিক্ষিত চিকিৎসক সম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর জনসমাজের কাছে পেশ করা।'' বাস্তবিক, শুধু 'প্লেগ্' নয়, রাধাগোবিন্দের সব গ্রন্থরচনার এই একই লক্ষ্য।

স্বীকৃত ইংরেজি বইয়ের প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ নয়। এই বইগুলির মূল সম্পদ সময়ের থেকে অনেকটা এগিয়ে থাকা তাঁর বাস্তব দূরদৃষ্টি। প্রথমত গ্রামের স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সংক্রামক রোগের প্রতিরোধে তাঁর পরিকল্পনা আজও প্রাসঙ্গিক। রোগ হলে তার চিকিৎসা করায় সীমাবদ্ধ না থেকে রোগকে রুখবার সুলুক-সন্ধান খুঁজে বার করা যে আর্থসামাজিক দিক থেকে অনেক কার্যকর—জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার এই নীতিটি অনেক আগেই তিনি আমাদের দেশে প্রয়োগ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

আর দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতি সমন্বয়ের যে-কথাটি বলা হয়েছে সেটি গুরুত্বের বিচারে আরও একটু বিস্তারিতভাবে পুনরুল্লেখের প্রয়োজন। এই সমন্বয়ের পেছনে শুধু স্বদেশপ্রেমের আবেগ বা সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধাচরণ ভাবলে ভুল হবে। তিনি এমন এক বাস্তবোচিত চিকিৎসা পরিষেবা খুঁজে নেওয়ার কথা তাঁর বইগুলিতে বলেছেন যা ভারতীয় জনগণের পক্ষে একাধারে কার্যকর, সুলভ এবং গ্রহণযোগ্য। আজকের জনস্বাস্থ্য বিজ্ঞান এই ধারণাকেই চিকিৎসার 'হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ' বা 'সামগ্রিক অভিমুখীনতা' হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছে। তাঁর এই ধারণা প্রয়োগের এবং সেইসঙ্গে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষায় তাঁর দায়বদ্ধতার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটে প্লেগ মোকাবিলার কালে। তাই কলকাতার প্লেগ মহামারিতে তাঁর ভূমিকার কথা আলাদা করে আলোচনা করা দরকার। এটি শুধু তাঁর কর্মযোগের এক পবিত্র পর্ব নয়, আমাদের দেশের জনস্বাস্থ্য রক্ষার ইতিহাসে এক শিক্ষণীয় অধ্যায়।

প্লেগ ও ভগিনী নিবেদিতা

করাচি থেকে পুনে; সেখান থেকে মুম্বই; বছর দুয়েক সময় নিয়ে অবশেষে কলকাতায়। না, কোনও পর্যটকের ভ্রমণসূচি নয়। এটি ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে প্লেগ মহামারির যাত্রাপথ। আর এই পথে তার ধ্বংসলীলা সম্পর্কে সত্যি-মিথ্যে নানা দুঃসংবাদ শুনে শুনে কলকাতাবাসী আতঙ্কিত ছিল ১৮৯৮ সালে কলকাতায় প্লেগ পদার্পণের আগে থেকেই। ক্রমে মহামারি দেখা দিতে সেই আতঙ্কে ঘৃতাহুতি হল। অনুসন্ধান পত্রিকার ২৫ বৈশাখ ১৩০৫ সংখ্যার প্রতিবেদন : ''কলিকাতার লোকের আতঙ্ক ভয়ানক বৃদ্ধি পাইয়াছিল।... সকলেই বিভব দূরে ফেলিয়া পুত্রকন্যা সঙ্গে লইয়া শহর ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।... কেহ রেলওয়ে স্টেশন অভিমুখে, কেহ স্টিমার ঘাটে, কেহ নৌকো সন্ধানে, কেহ গাড়িতে, কেহ পদব্রজে—যে যেরূপে যেদিকে সুবিধা পাইল সে সেইরূপে সেইদিকে ছুটিতে লাগিল।''

কিন্তু ছুটলেই তো হবে না। প্লেগের আওতার বাইরে দূরে কোথাও আশ্রয় পাওয়ার মতো যোগাযোগ বা আর্থিক সামর্থ্য তো সাধারণ গরিব মানুষের নেই। তাই তাঁরা বাধ্য হলেন আতঙ্ককে সঙ্গী করে, কলকাতায় থেকে যেতে। প্লেগের টীকা তখন সরকারি স্বাস্থ্য দপ্তরে মজুত। কিন্তু ব্রিটিশ প্রশাসনের গাফিলতি এবং টীকার বিরুদ্ধে নানা

রটনা কলকাতায় সার্বিক টীকাকরণ অভিযানকে ব্যাহত করছিল। এই পরিস্থিতিতে নিজের পসারের চরম ক্ষতি করে ডা. রাধাগোবিন্দ কর প্লেগ মহামারি নিয়ন্ত্রণে মানুষের এবং সেই সঙ্গে প্রশাসনের পাশে এসে দাঁড়ালেন। আক্রান্তের চিকিৎসা, জনসচেতনতা বাড়াতে লেখালেখি এবং ব্রিটিশরাজ প্রতিনিধিদের পরামর্শ দেওয়া— এই তাঁর ত্রিমুখী কর্মকাণ্ড। উত্তর কলকাতার অলিগলিতে তিনি রোগী দেখতে ঘুরে বেড়াতেন। রোগীর খবর পেলে শ্যামবাজার, বেলগাছিয়া এবং দমদমের বস্তি এলাকায় সাইকেল চালিয়ে পৌঁছে যেতেন। এত বিপুল সংখ্যক সংক্রামক রোগীকে হাসপাতালে জায়গা দেওয়া অসম্ভব; তাই ড. করের পরামর্শ মেনে ছোটলাট স্যার জন উডবার্ন নির্দেশ জারি করেন, রোগীকে তার নিজের বাড়িতে আলাদাভাবে রেখে চিকিৎসা করা যাবে। রাধাগোবিন্দ করের মস্তিষ্কপ্রসূত এই নিভৃতবাসের বাস্তব ধারণা আবার প্রয়োগ করা হয় প্রায় ১২০ বছর পর, কোভিড মহামারির কালে। এটি একটি উদাহরণ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে প্রতিরোধী স্বাস্থ্য পরিষেবার ওপর তাঁর গুরুত্ব আরোপ ভারতবর্ষের জনস্বাস্থ্য নীতির দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তি তৈরি করেছিল।

কিন্তু প্লেগ মোকাবিলায় নেতৃত্ব একা ড. করের নয়। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে স্বামী বিবেকানন্দ পরিকল্পিত জনস্বাস্থ্য উদ্যোগে রামকৃষ্ণ মিশনের কাণ্ডারীদের কথা। আর সেই সূত্রে ডা. করের সুযোগ হয় ভগিনী নিবেদিতার সংস্পর্শে আসার।

ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'Studies from an Eastern Home' গ্রন্থের 'প্লেগ' শীর্ষক নিবন্ধে স্মৃতিচারণ করেছেন, " 'সিস্টার, আপনার একজন রোগী আছে।' দোরগোড়ায় ডাক্তারের গলা শোনা গেল, তখনই বুঝলাম তিনি কী বলতে চাইছেন। আমার প্রথম প্লেগ রোগী।" তার মানে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়ানো সেই 'বারো কি চোদ্দো বছরের উজ্জ্বল ছেলেটি'-র সূত্রেই নিবেদিতা-রাধাগোবিন্দ যোগাযোগ। নিঃস্বার্থ সেবার সেই কেজো যোগাযোগ দ্রুত আন্তরিক হয়ে ওঠে। ডা. কর স্মৃতিচারণ করেছেন, ''১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে প্লেগ সংহারক রূপে দেখা দেয়।... সেই সময়ে একদিন চৈত্রের মধ্যাহ্নে রোগী পরিদর্শনান্তে গৃহে ফিরিয়া দেখিলাম, দ্বারপথে ধূলিধূসর কাষ্ঠাসনে একজন য়ুরোপীয় মহিলা উপবিষ্টা। ইনিই ভগিনী নিবেদিতা...। সেইদিন প্রাতে বাগবাজারে কোন বস্তিতে আমি একটি প্লেগাক্রান্ত শিশুকে দেখিতে গিয়াছিলাম। রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যই সিস্টার নিবেদিতার আগমন।''

দেশীয় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির থাবা থেকে দেশীয় স্বাস্থ্য পরিষেবাকে রক্ষার জন্য ডা. কর বরাবর চেষ্টা করে গেছেন; চেষ্টা করেছেন আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ সাধারণ মানুষের কাছ অবধি পৌঁছে দিতে। সেইজন্যই বাংলা ভাষায় তাঁর ডাক্তারি বই লেখা। সেই জন্যই, অধিকাংশ বিদেশে শিক্ষিত চিকিৎসক যখন ইউরোপ থেকে আমদানি করা উচ্চ মূল্যের ওষুধ প্রেসক্রাইব করছেন, তখন ডা. নীলরতন সরকার এবং তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যাল-এ উৎপাদিত সমমানের কিন্তু কম দামের ওষুধগুলির পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেন। এবং সেই একই

উদ্দেশ্যে তিনি এক দেশীয় স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরির স্বপ্ন দেখেন।

কলকাতায় তখন সম্ভ্রান্ত 'ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ' ছাড়া কয়েকটি মেডিক্যাল স্কুল। সেগুলির পক্ষে অবিভক্ত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার প্রায় ৮ কোটি মানুষের চাহিদা পূরণ প্রায় অসম্ভব—উপযুক্ত সংখ্যক চিকিৎসক তৈরির দিক থেকে অসম্ভব, মানুষকে আধুনিক চিকিৎসা প্রদানের দিক থেকেও অসম্ভব। সেই সঙ্গে রয়েছে বিদেশি সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতি। এই পরিস্থিতিতে রাধাগোবিন্দ এক অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা করেন—ব্রিটিশ রাজের কর্তৃত্বের বাইরে গিয়ে মাতৃভাষায় আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। অনেকে তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন। তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও একজন। তিনি মত প্রকাশ করেন, ''সাধারণ স্কুল এবং মেডিকেল স্কুল স্থাপন করার মধ্যে অনেক প্রভেদ। কয়েকটি বেঞ্চ ও চেয়ার নিয়ে একটি সাধারণ স্কুল স্থাপন করা যায়। কিন্তু মেডিকেল স্কুল স্থাপনের আগে বিস্তর অর্থ, সরঞ্জাম এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক জোগাড় না হলে মেডিকেল স্কুল একটি ভুয়ো জিনিস মাত্র।''

বিষয়টি সম্পর্কে যে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ এবং তারপর ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডাক্তারি পড়ে আসা ডা. রাধাগোবিন্দ অসচেতন ছিলেন তা কখনই নয়। তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা জেনে বুঝেই এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাগমনের অল্পকাল পরে তাঁরই আগ্রহে ১৮ অক্টোবর ১৮৮৬ কলকাতা বৈঠকখানা বাজারের এক ঘরে ডা. এম. এম. বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সেই সময়ের ৯ জন সুপ্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক এক সভা করলেন। সেখানে তাঁরা সহমত হলেন, জাতীয় স্বার্থে অবিলম্বে এক বেসরকারি চিকিৎসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে।

আক্ষরিক অর্থে 'অবিলম্বে' কাজ শুরু হল। মিটিংয়ের পরের মাসে নভেম্বর ১৮৮৬ বৈঠকখানা বাজারে শুরু হল 'ক্যালকাটা স্কুল অফ মেডিসিন'। প্রাথমিকভাবে শুরু হল আয়ুর্বেদ বিভাগ। পরের বছর প্রতিষ্ঠানটি সরে এল বৌবাজারে। পরের বছর আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান বা অ্যালোপ্যাথি বিভাগটি পৃথকভাবে কাজ শুরু করল। সরকারি মেডিক্যাল স্কুলগুলির পাঠ্যসূচি অনুসারে এখানে ডাক্তারি পড়ানো হত। পড়ানোর মাধ্যম ছিল বাংলা ভাষা। সহায় ছিল ডা. রাধাগোবিন্দের লেখা বইগুলি। আগস্ট ১৮৮৭ প্রতিষ্ঠানটির নাম হল 'ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল'। ক্লিনিকাল ক্লাস শুরু হয় মেয়ো হাসপাতালে আর চাঁদনি হাসপাতালে। ১৬ ডিসেম্বর ১৮৮৮ স্কুল পরিচালন সমিতির সম্পাদক হন ডা. রাধাগোবিন্দ; এবং আজীবন অর্থাৎ টানা ৩০ বছর সসম্মানে তিনি এই পদে কাজ করে গেছেন এক আত্মপ্রচারবিমুখ, নীরব কর্মী হিসেবে।

তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানটির উন্নতি হয় খুব দ্রুত। ১৮৮৯-৯০ সালে সরকারি অনুমতি নিয়ে ছাত্রদের শিক্ষার জন্য শবব্যবচ্ছেদ শুরু হয়। শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন সেকালের প্রখ্যাত চিকিৎসকরা : ডা. জগদ্বন্ধু বসু, ডা. লালমাধব মুখোপাধ্যায়, ডা. রাধাগোবিন্দ কর, ডা. নীলরতন সরকার, ডা. সুন্দরীমোহন দাস। তাঁরা প্রায় সকলেই বিনা বেতনে ছাত্রদের পড়াতেন। অনেক গরিব ছাত্রও বিনা মাইনেয় পড়ার সুযোগ পেত। মাত্র ৮ জন ছাত্র নিয়ে মেডিক্যাল স্কুলের যাত্রা শুরু হয়।

১৮৯৯-৯০ সালে ছাত্রসংখ্যা বেড়ে হয় ২৫০। আউটডোরে প্রচুর রোগী হত। ১৮৯৭ সালে স্কুল উঠে আসে আপার সার্কুলার রোডে। স্কুল সংলগ্ন জমিতে শুরু হয় ১৪ শয্যা বিশিষ্ট এক ছোট নিজস্ব হাসপাতাল। ওই বছরই শিক্ষাকাল তিন থেকে বাড়িয়ে চার বছর করা হয়।

স্কুলের পরবর্তী অগ্রগতির কথা বলার আগে তার প্রাথমিক অর্থ সংকুলানের কথা বলে নেওয়া দরকার। এই প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের মতো অনেকেই সন্দিহান থাকায়, তহবিল শুকনোই থাকছিল। ডা. রাধাগোবিন্দ কর সহ উদ্যোগী মানুষদের নিঃস্বার্থ দান দেখা যাচ্ছিল যথেষ্ট নয়। তখন রাধাগোবিন্দ অর্থ সংগ্রহের এক অভিনব উপায় বার করেন। জমিদার বা ধনীদের কোনও বিবাহ অনুষ্ঠান কলকাতায় হলে নিমন্ত্রণ বাড়ির দ্বারদেশে দেখা যেত মেডিক্যাল স্কুলের জন্য সাহায্যপ্রার্থী ডা. কর দণ্ডায়মান।

প্রচলিত মহাজনবাক্য : ভাল কাজে অর্থের অভাব হয় না। এক্ষেত্রেও সেই বিশ্বাসই প্রতিষ্ঠিত হল—পরের বছরই এক অভাবিত সূত্রে সরকারি অনুদান পাওয়া গেল। প্রিন্স অ্যালবার্ট ভিক্টরের ভ্রমণ তহবিল থেকে ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুলের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়। সেই সঙ্গে অর্থসাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসেন কিছু আগ্রহী বাঙালি। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্যার যতীন্দ্রমোহন সেন এবং ডা. লালমাধব মুখোপাধ্যায়। সেই অর্থে ১৮৯৮ সালেই বেলগাছিয়ায় ১২ বিঘা জমি কেনা হয়—এটিই বর্তমান আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের জমি। আনুমানিক ৭০ হাজার টাকা ব্যয়ে এখানে ৩৬ শয্যার একটি একতলা হাসপাতাল তৈরি হয়। ফেব্রুয়ারি ১৯০২ অ্যালবার্ট ভিক্টরের নামাঙ্কিত সেই হাসপাতাল উদ্বোধন করেন স্যার জন উডবার্ন।

১৯০৩ সালে 'ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল' এবং বেসরকারি 'কলেজ অফ ফিজিশিয়ান অ্যান্ড সার্জেন্স অফ বেঙ্গল' একসঙ্গে মিলে গেল। তারা যৌথভাবে ডাক্তারি স্কুলে ছাত্রদের বাংলা ভাষায় চার বছরের এবং কলেজে ইংরেজি ভাষায় পাঁচ বছরের কোর্স চালাতে থাকে। ১৯০৯ সালে বেলগাছিয়া হাসপাতালের দোতলা তোলা হয়। শয্যা সংখ্যা বেড়ে হয় ১০০।

১৯১১ সালে মেডিক্যাল রেজিস্ট্রেশন বিল

আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ, প্রাচীন চিত্র

চালু হওয়ার পর প্রস্তাব দেওয়া হয়, সরকারি শর্তাবলি পূরণ করতে পারলে বেলগাছিয়ার বেসরকারি হাসপাতালটিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আনা হবে। তাতে ব্রিটিশ সরকার এবং মেডিক্যাল কাউন্সিলের অনুমোদন পাওয়া যাবে। শর্ত পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে নেমে দেখা গেল বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এবার সাগ্রহে এগিয়ে এলেন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিশেষ সাহায্য করলেন বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল, স্যার পাড লিউকিস ও স্যার শংকর নায়ার। অবশেষে ৫ জুলাই ১৯১৬ লর্ড কারমাইকেল দেশের এই প্রথম অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজটির উদ্বোধন করেন। প্রাথমিকভাবে তার নাম হয় 'বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ'। ১৯১৯ সালে নাম দেওয়া হয় 'কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ'।

তার এক বছর আগে ১৯ ডিসেম্বর ১৯১৮ স্প্যানিশ ফ্লুতে আক্রান্ত হয়ে ডা. কর মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু তার পরেও স্বপ্নসম্ভব প্রতিষ্ঠানটির প্রতি তাঁর কতর্ব্যকর্মে দাঁড়ি পড়েনি। জীবৎকালে তাঁর সম্পদের সিংহভাগই তিনি এর জন্য ব্যয় করেছেন, দান করেছেন তাঁর জন্য নির্মিত শ্যামবাজারের বাড়িটিও। মৃত্যুর পর জানা যায় তাঁর ইচ্ছাপত্র অনুসারে, স্ত্রীর ৭৫,০০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তিও কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে দান করে গেছেন।

শুধু সম্পদ নয়, তিনি তাঁর মেধা, মনন, অভিজ্ঞতা, সময় সব কিছুই দান করে গেছেন সাধারণ মানুষের সেবায় নিবেদিত এক দৃষ্টান্তমূলক দেশীয় প্রতিষ্ঠান নির্মাণে। তাই সেই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তাঁকে স্মরণীয় করে রাখার দায়িত্ব আমাদের। সেই দায়বদ্ধতা থেকে ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠানটির নাম হয় আর. জি. কর মেডিক্যাল কলেজ। সেই কথা দিয়েই এই আলোচনা শুরু।

শেষ করি এক শুভ কামনা বা প্রতিজ্ঞায় : যাবতীয় কলুষ আর অপবিত্রতার ঊর্ধ্বে উঠে এই প্রতিষ্ঠান যেন সাধারণ মানুষের প্রতি সতত সহমর্মিতায় আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র প্রয়োগ করতে পারে, যেমন আজীবন করে গেছেন ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর। নি

তথ্যসূত্র

১। *International Journal of Ayurveda Research,* Oct-Dec 2024

২। *বলাকা পত্রিকা,* বর্ষ ১৮ সংখ্যা ২৮, ২০০৯

৩। আনন্দবাজার. কম, ২২ অগস্ট ২০২৪

৪। Prof. Ayan Datta, *Dr. R G Kar : The Visionary Behind India's First Private Medical College*, Science India, 14 October 2024.

৫। রাধাগোবিন্দ কর, *প্লেগ,* সম্পাদক : সুধীর কুমার চট্টোপাধ্যায়, সূত্রধর, কলকাতা, ২০১১

৬। সুধীর কুমার চট্টোপাধ্যায়, *রাধাগোবিন্দ কর ('একশো তারার আলো' গ্রন্থে সংকলিত),* গাঙচিল, কলকাতা, ২০২২

৭। *নিবেদিতা রচনাসংগ্রহ,* খণ্ড ২, বইপত্র, কলকাতা, ১৯৭৮

৮। বিপিনবিহারী গুপ্ত, *পুরাতন প্রসঙ্গ,* সম্পাদক : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৮৯